হাকালুকি হাওড়: রূপে রঙে যেন অপরূপ

১৩০০ নদ-নদী আপন গতিতে বয়ে যায় এ বদ্বীপে। এ ভূখণ্ডকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে হাওড় গুলো। এর মধ্যে অন্যতম হাকালুকি হাওড়। চলুন জেনে নেই দেশের বৃহৎ এই মিঠা পানির জলাভূমির অদ্যোপান্ত।

হাসান নীল

প্রচলিত গল্প ও লুকানো সম্পদ

অনেক বছর আগের কথা। সে সময় ত্রিপুরা অধিপতি ছিলেন ওমর মানিক্য। ওমর মানিক্যের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা আশপাশের কারও অজানা ছিল না। একবার এই ত্রিপুরা অধিপতির রোষানলে পড়েছিলেন বড়লেখার কুকি সম্প্রদায়ের দলপতি হাঙ্গর সিং। হাঙ্গর সিং তটস্থ হয়ে পড়েছিলেন ওমর মানিক্যের ভয়ে। উপায় খুঁজে না পেয়ে প্রাণ বাঁচাতে আত্মগোপন করেছিলেন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও কর্দমাক্ত এক বিস্তীর্ণ এলাকায়। হাঙ্গর সিংয়ের লুকিয়ে থাকার পর থেকেই ওই অঞ্চল পরিচিতি পায় 'হাঙ্গর লুকি' নামে। পরে কালের পরিক্রমায় তা আস্তে আস্তে হয়ে ওঠে 'হাকালুকি'। এভাবেই এ হাওড় পরিচিত হয়ে উঠে হাকালুকি হাওড় নামে। তবে অনেকে হাকালুকি হাওড়ের নামকরণের এ গল্প বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে, আজ থেকে হাজার দুয়েক বছর পূর্বে প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প হয়েছিল। সে ভূমিকম্পে মাটির নিচে সম্পূর্ণ তলিয়ে গিয়েছিল অকা নামক এক রাজা ও তার রাজ্য। এরপর থেকে ওই তলিয়ে যাওয়া অঞ্চলের নাম হয় আকা রাজার নামে 'আকা লুকি'। পরে 'আকালুকি' থেকে সবার কাছে পরিচিতি পায় 'হাকালুকি' নামে।

এই গল্পও বিশ্বাস করতে পারেনি স্থানীয়রা। তাদের রয়েছে ভিন্ন গল্প। তাদের মতে, হাকালুকির কাছে একসময় বসতি ছিল কুকি ও নাগা উপজাতির। তাদের ছিল নিজস্ব ভাষা। তাদের ধারণা ছিল, জঙ্গল ও কর্দমাক্ত এই নিম্নাঞ্চল লুকানো সম্পদের ভান্ডার। ওই বিশ্বাস থেকেই তারা নিজেদের ভাষায় হাওড়ের নাম রাখে 'হাকালুকি'; যার অর্থ 'লুকানো সম্পদ'। আরও একটি দল বিশ্বাস করে, এক সময় বড়লেখা থানার পশ্চিমাংশে ছিল হেংকেল উপজাতির বাস। তাদের নামানুসারেই এ হাওরের নাম প্রথমে হেংকেল ও পরে ধীরে ধীরে হাকালুকি হাওড় হিসেবে পরিচিতি পায়।

হাকালুকি হাওড়ের বিস্তার

হাকালুকি বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড়। এটি সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলা দুটির পাঁচটি উপজেলায় অবস্থিত। হাওড়ে মিলেমিশে আছে ছোট-বড় ২৪০টি ছোট জলাশয়। এগুলোকে বিল বলা হয়। এছাড়া ছোট-বড় ১০টি নদীও রয়েছে হাওড়ে। এই বিল ও বয়ে যাওয়া নদীগুলো বর্ষা এলে জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেসময় ফুলে ফেঁপে হাওড়ের আয়তন দাঁড়ায় ১৮ হাজার হেক্টর। চলুন এবার দেখি পাঁচ উপজেলা কোথায় কতটুকু বিস্তৃত এ হাওড়। হাকালুকির বেশিভাগ অংশ বড়লেখায়। এ হাওড় কন্যার ৪০ শতাংশই রয়েছে এ উপজেলা। এরপরই আসে কুলাউড়ার নাম। হাকালুকির প্রায় ৩০ শতাংশ কুলাউড়ার মাঝে বিস্তৃত। বাকি ৩০ ভাগের ১৫% রয়েছে ফেঞ্চুগঞ্জে, ১০% গোলাপগঞ্জের দখলে। আর অবশিষ্ট ৫ শতাংশ আছে বিয়ানীবাজারে।

পাহাড় ঘিরে আছে পরম মমতায়

হাকালুকি শুধু দেশের অন্যতম বৃহৎ হাওড় ই না। এটি বৃহৎ মিঠা পানির জলাভূমিও বটে। বৃহৎ এ জলাধারের দুই দিকে রয়েছে পাহাড়ের বেষ্টনি। এর পূর্বে রয়েছে পাথারিয়া ও মাধব পাহাড়। পশ্চিমাংশ ঘেরা ভাটেরা পাহাড়ে। তাই বলা যায়, হাকালুকিকে যেন পাহাড় ঘিরে আছে পরম মমতায়।

বর্ষায় হাকালুকি যেন অপরূপ

ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। দুই মাস পরপরই তার রূপ পাল্টায়। হাকালুকিও এই ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। ঋতুভেদে প্রকাশ করে নিজের মোহনীয় রূপ। তবে তার এই সৌন্দর্য বিকশিত হয় শীত ও বর্ষাকালে। বিশেষ করে বর্ষায় হাকালুকি যেন হয়ে ওঠে অপরূপ সৌন্দর্যের

লীলাভূমি। ২৪০টি বিল ও ১০টি নদী একে অন্যের সঙ্গে মিলে যায়। যেদিকেই চোখ যায় দৃষ্টিজুড়ে থাকে সাদা মখমল রঙের পানি। এসময় হাওড়ের সৌন্দর্য হয় দেখার মতো। হাকালুকির বুকে গলা পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোকে তখন শখের বনসাই মনে হয়।

শীতের হাওড় যেন সন্তানবৎসল মা

হাকালুকি হাওড় রূপে রঙে একাকার হয়ে ওঠে শীতকালে। এ মৌসুমে হাওড়ের সৌন্দর্য শুধু চোখ না মনও জুড়িয়ে দেয় পর্যটকদের। শীত মৌসুমে এদেশ হয়ে ওঠে অতিথি পাখিদের আশ্রয়স্থল। শীতপ্রধান দেশগুলোতে নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে তাপমাত্রা এতটাই নেমে যায় যে, পাখ-পাখালির জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসময় সেখানকার পাখিরা ডানা মেলে হাজার মাইল দূরের নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলোর উদ্দেশে। পরিযায়ী পাখিরা এ বদ্বীপকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নেয়।

এদেশে আসা অতিথি পাখিদের বড় একটি অংশ সাময়িক নিবাস হিসেবে মাথা গুঁজে হাকালুকির বিলগুলোতে। নানা রঙের বিদেশি পাখির কলকাকলিতে ভরে ওঠে। বিশেষ করে শীতের দিনে দুপুরের পর থেকে বিকেল পর্যন্ত অতিথি পাখিদের বেশি দেখা যায়। সেই দলে থাকে রাজসরালি, বালিহাঁস, ভূতিহাঁস, পানকৌড়ি, ল্যাঞ্জাহাঁস, গুটি ঈগল ইত্যাদি। এই দৃশ্য পর্যটকদের মন ভরিয়ে দেয়। এ ছাড়া পৌষ-মাঘে হাওড় থেকে জল নেমে গেলে স্থানীয় চাষীরা সেখানে ফসল ফলায়। নানা ফসলে ভরে উঠে হাওরের বুক। বিভিন্ন বিলে মাছ ধরার দৃশ্যগুলোও তখন বড়ই মনোহর লাগে। সবমিলিয়ে বলা যায় শীতকালে হাওড় যেন ওঠে সন্তানবৎসল মা। যার আঁচলে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেয় পাখি আর ফসল।

হাওরের বুকের জীবন

হাওড়ের বুকে স্থায়ী বিলগুলোতে নানা প্রজাতির উদ্ভিদের বাস। এখানে ৫২৬ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪১৭ প্রজাতির পাখি রয়েছে। এরমধ্যে অতিথি পাখি ১১২ প্রজাতির আর ৩০৫ প্রজাতির দেশীয় পাখি। এছাড়া ১৪১ প্রজাতির অন্যান্য বন্যপ্রাণী রয়েছে। হাওড়ের জলে বাস করে ১০৭ প্রজাতির মাছ। এরমধ্যে ৩২ প্রজাতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিপন্ন প্রায়। এছাড়া নাম না জানা আরও কত উদ্ভিদ ও কীট-পতঙ্গের বসতি এই হাকালুকিতে। এখানকার উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল হাওড়ের ভাসমান গছপালা যা ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কোনবা পথে হাকালুকি যাই

মৌলভীবাজার থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে হাকালুকি হাওড় অবস্থিত। ঢাকা থেকে যেতে হলে আগে আপনাকে পৌঁছাতে হবে মৌলভীবাজার। রাজধানীর মহাখালী, গাবতলী, সায়েদাবাদ, আবদুল্লাহপুর পয়েন্টগুলো থেকে সরাসরি বাস যায় সিলেটে। আপনি সুবিধাজনক জায়গা থেকে বাসে চেপে বসতে পারেন। মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পর্যন্ত যেতে আপনাকে ভাড়া গুনতে হবে ৩৫০ থেকে ৯০০ টাকা পর্যন্ত।

এরপর কুলাউড়া থেক অটোয় চেপে সোজা চলে যেতে পারেন হাকালুকি হাওড়ে। এজন্য ভাড়া গুনতে হতে পারে ১৫০-২০০ টাকা। তবে আপনাকে যে বাসে চেপেই হাওড় দেখতে আসতে হবে এমনটা না। অনেকের ট্রেন জার্নি ভীষণ পছন্দ। কোলাহলময় শহরকে পাশ কাটিয়ে সবুজ দেখতে দেখতে যাওয়ার মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না। তারা চাইলে কমলাপুর কিংবা বিমানবন্দর স্টেশন থেকে উপবন, জয়ন্তিকা, পারাবত, কালনী এক্সপ্রেসে উঠে বসতে পারেন। এক্ষেত্রে কুলাউড়া পর্যন্ত ভাড়া গুনতে হবে ২৮০ থেকে ৬৫০ টাকা। হাকালুকি যেতে হলে আপনাকে যে কুলাউড়াই নামতে হবে এমন কোনো কথা নেই। চাইলে রাতের উপবনে করে সিলেটের ঠিক আগে মাইজগাঁও স্টেশনে নেমে পড়তে পারেন। এরপর সেখান থেকে অটোরিক্সায় চেপে চলে আসুন ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে। মাত্র এক কিলোমিটারের পথ।

ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে নেমে চোখেমুখে একটু পানির ঝাপটা দিয়ে নিতে পারেন। এতটা পথ ভ্রমণ শেষ শরীর চাঙা করার পাশাপাশি পেটেও কিছু পড়া দরকার। আপ্যায়নের জন্য তৈরি আছে বেশকিছু রেস্টুরেন্ট। ফ্রেশ হয়ে কিছু খেয়ে ফের বেড়িয়ে পড়তে পারেন গন্তব্যের উদ্দেশে। ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারের নৌকাঘাট থেকে রোজই যাত্রীবোঝাই নৌকা কুশিয়ারি নদী পাড়ি দিয়ে হাকালুকি হাওড়ে পৌঁছায়। সেই দলে ভিড়ে যেতে পারেন আপনিও। যদি আরও স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে চান তবে আকাশপথ বেছে নিতে পারেন। ঢাকা থেকে বিমানে চেপে চলে যাবেন সিলেট। তারপর সেখান থেকে বাসে করে মৌলভীবাজার, এরপর হাওড়।

যাবেন তো, থাকবেন কোথায়

হাওড়ে যাবেন অথচ রাতের বেলায় চাঁদের আলোয় গা ভেজাবেন না তা কী হয়! সেখানে ইজারাদারদের ছোট ছোট ঘর রয়েছে। চাইলে তাদের অনুমতি নিয়ে সেখানে রাত্রিযাপন করতে পারেন। ২-৪ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকে কুটিরগুলোতে। তা যদি না চান, তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতে পারেন। এক্ষেত্রে নিরাপত্তার কথাটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তবে হাওড়ের বিল এলাকায় তাঁবুতে রাত্রিযাপন আপনাকে দিতে পারে ভিন্ন কিছু অনুভূতি; যা একেবারেই অকল্পনীয়।

খাবেনইবা কী

খাওয়ার বন্দোবস্তটা নিজেকেই করতে হবে। এক্ষেত্রে কয়েকটি উপায় জেনে নিতে পারেন। হাওড়ের জলে ভাসতে আপনাকে তো অবশ্যই নৌকা ভাড়া করতে হবে। মাঝির সাথে কথা বলে নিতে পারেন। কিছু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিলে সে রাঁধুনির দায়িত্ব নিতে পারে। সেক্ষেত্রে বাজারটা আপনাকেই করে দিতে হবে। তবে অল্প টাকায় পেট পূজা সারতে চাইলে স্থানীয় কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কিছু টাকা দিলে মাছের ঝোল আর গরম ভাতে দুপুরটা উপভোগ্য করে তোলার দায়িত্বটা তারাই নিতে পারে। এছাড়া সাথে শুকনো খাবার হিসেবে বিস্কুট, পাউরুটি, ফল রাখতে পারেন। কোনো উপায় না হলে এগুলোই ভরসা হয়ে দাঁড়াবে তখন আপনার জন্য।